হাসিয়া দাশ বলিল—বেশ তো, কামারণী তো আর নীচ-সংসর্গ নয়। বেটাকে যখন জব্দই করবে—তখন ঘরের হাঁড়িসুদ্ধ এঁটো করে দাও না।

শ্রীহরি চুপ করিয়া রহিল। এ কামনাটা তাহার বুকে আগ্নেয়গিরির অগ্নিপ্রবাহের মতোই রুদ্ধমুখ চাপা হইয়া আছে। নাড়া খাইয়া সেই প্রচ্ছন্ন অগ্নিশিখা ভিতরে ভিতরে প্রবল হইয়া উঠে।

ওদিকে দাশ ফ্যা-ফ্যা করিয়া হাসিতে আরম্ভ করিল।

শ্রীহরির উগ্র চোখ দুইটি সঙ্গে সঙ্গে যেন জলিয়া উঠিল। ওই উজ্জ্বল-শ্যামবর্ণা দীর্ঘাঙ্গী বধূটির প্রতি তাহার অন্তরের নগ্ন-কামনার একটি প্রগাঢ় আসক্তি আছে। তাহার মনে পড়ে, ডোবার ঘাটে দণ্ডায়মানা পদ্মের অবগুণ্ঠিত মুখ;—বড় বড় চোখ, ছোট কপাল ঘিরিয়া ঘন কালো এক রাশি চুল, ঈষৎ বাঁকা নাক, গালের পাশে বড় একটি তিল,—তাহার হাতে শাণিত দা, নিটুর কৌতুকের মৃদু-হাসিতে বিকশিত ছোট-ছোট সুন্দর দাঁতের সারিটি পর্যন্ত তাহার মনোমধ্যে ঝলমল করিয়া উঠে।

দাশ হাসি থামাইয়া বলিল—তোমার টাকা আছে, ভাগ্যিমান লোক তুমি, তুমি যদি ভোগ না কর তো ভোগ করবে কি রামা-শ্যামা?

বহুক্ষণ পরে অজগরের মত একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া শ্রীহরি বলিল—ছাড়ান দেন, দাশজী, ওসব কথা। এখন আমি যা বললাম তার কি করছেন বলুন।

—তার আর কি, 'পাল' কেটে 'ঘোষ' করতে আর কতক্ষণ? তবে—জমিদারী সেরেস্তার নিয়ম জান তো—'ফেল কড়ি মাখ তেল', জমিদারকে কিছু নগদ ছাড়, দস্তুরী দাও। আর তা ছাড়া একটা খাওয়াও। শ্রীহরির মুখের দিকে চাহিয়া দাশ বলিল—হ্যাঁ হে, মদও ছেড়েছ নাকি? যে রকম গতিক তোমার? দাশ একটু বাঁকা হাসি হাসিল।

শ্রীহরি হাসিয়া বলিল—না, না, সে হবে বৈকি! তবে কথা হচ্ছে ওসব আর ঢাক পিটিয়ে হৈ-হৈ করে কিছু করব না। গোপনে আপনার ঘরে বসে যা হয় একটু—মাঝে মাঝে—!

—নিশ্চয়! ভদ্রলোকের মত! দাশজী বারবার ঘাড় নাড়িয়া শ্রীহরির যুক্তি স্বীকার করিয়া বলিল—'একশোবার, আমি আগে কতবার তোমাকে বারণ করিচি মনে আছে? বলেছি 'পাল, ঐ রকম ধারা-ধরন তোমাকে শোভা পায় না' যাক, শেষ পর্যন্ত তুমি যে বুঝে সামলেছ—এও ভাল।

দাশজীর কথা শ্রীহরিও স্বীকার করিয়া বলিল—হ্যাঁ, সে আমি বুঝে

দেখলাম দাশজী, মান-সম্মান আপনার ও-রকম করে হয় না, সে-কাল এখন আর নাই।

জমিদারী সেরেস্তার বহুদর্শী বিচক্ষণ কর্মচারী দাশজী, সে হাসিয়া বলিল—কোনকালেই হয় না বাবা, কোনকালেই হয় না। ত্রিপুরা সিংয়ের কথা বল তুমি—তাকে লোকে আজও বলে ডাকাত। সেইটা কি মান সম্মান নাকি? এই দেখ, এই কঙ্কণার মুখুজ্জেবাবুদের কথা দেখ। বড়লোক হল—তাতেও লোকে বাবু বলত না। তারপর ইস্কুল দিলে, হাসপাতাল দিলে, ঠাকুর পিতিষ্ঠে করলে—অমনি লোকে ধন্যি-ধন্যি করলে, বাবু তো বাবু একেবারে বড়বাবু—বড়বাড়ীর বড়বাবু খেতাব হয়ে গেল।

এবার চণ্ডীমণ্ডপটা আমিও বাঁধিয়ে পাকা করে দেব, দাশজী! আর চণ্ডীমণ্ডপের পাশে একটা কুয়ো!

—বাস্, বাস্, পাকা করে খুদে লিখে দাও কুয়োর গায়ে, চণ্ডীমণ্ডপের মেঝেতে—সেবক শ্রী শ্রীহরি ঘোষেণ প্রতিষ্ঠিতং; তারপর তোমার ঘোষ খেতাব মারেং কে? একেবারে পাকা হয়ে যাবে।

—আপনি কিন্তু ওটা করে দেন, সেটেলমেণ্টের পরচাতেও ঘোষ লেখাব আমি।

—কাল—কাল—কালই করে নাও না তুমি।

শ্রীহরিদের বংশ-প্রচলিত উপাধি পাল। শ্রীহরি পাল উপাধিটা পাল্টাইতে চায়। অনেকদিন হইতেই সে নিজেকে লেখে ঘোষ; কিন্তু আদালতে ঘোষ চলে না। তাই জমিদারী সেরেস্তায় তাহার নামের জমাগুলিতে পাল কাটাইয়া ঘোষ করিতে চায়। ওদিকে গভর্নমেণ্ট হইতে নূতন সার্ভে হইতেছে; রেকর্ড অব রাইট্‌সের দপ্তরেও ঘোষ উপাধি তাহার পাকা হইয়া যাইবে। পাল উপাধিটা অসম্মানজনক; যাহারা নিজের হাতে চাষ করে, তাহাদের—অর্থাৎ চাষীদের ঐ উপাধি।

দাশজী আবার বলিল—আর সে-কথাটার কি করছ?

—কোন্ কথা, কামার-বউয়ের কথা?

হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।—বলিল—সে তো হবেই হে। সে কথা আবার শুধোয় নাকি? আমি বলছিলাম গোমস্তাগিরির কথাটা।

শ্রীহরি লজ্জিত হইয়া পড়িল। অতর্কিতে সে ধরা পড়িয়া গিয়াছে। অপ্রস্তুতের মতই বলিল—আচ্ছা ভেবে দেখি!

ঠিক এই মুহূর্তেই ক্ষুর-ভাঁড় বগলে করিয়া আসিয়া হাজির হইল তারাচরণ

পরামাণিক। গভীর ভক্তির সহিত একটি নমস্কার করিয়া মোলায়েম হাসি হাসিয়া সম্ভাষণ জানাইল—পেনাম আজ্ঞে।

কপালের উপরে দৃষ্টি টানিয়া তুলিয়া তারাচরণের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দাশজী বলিল—এস, বাপধন এস। কি সংবাদ?

মাথা চুলকাইয়া তারাচরণ বলিল—গিয়েছিলাম কঙ্কণায়। বাড়ী এসেই শুনলাম, মা বললে—গোমস্তামশাই এসেছেন,—শুনেই, জোর-পায়ে আজ্ঞে আসছি—সে অকারণে হাসিতে লাগিল।

তারাচরণের এই হাসিটি তাহার ব্যবসায়ের অভিজ্ঞতা এবং বুদ্ধি হইতে উদ্ভূত। যাহারই ডাকে সে সর্বাগ্রে না যায়—সে-ই চটিয়া উঠে। তাই তারাচরণ মনস্তুষ্টির জন্য এই মিষ্টি হাসিটি হাসে, শ্লেষে তিরস্কারেও সে এমনি করিয়া হাসে। আরও একটি সত্য সে আবিষ্কার করিয়াছে—সেটিকেও সে কাজে লাগায়। প্রতিবেশীর গোপন তথ্য জানিবার জন্য মানুষের অতি ব্যগ্র কৌতূহল। সকাল হইতে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত সে গ্রামে গ্রামান্তরে নানা-জনের বাড়ীতে যায়। রামের বাড়ীর খবর সে শ্যামকে বলে, শ্যামের সংবাদ যদুকে দেয়; আবার যদুর কথা মধুকে নিবেদন করিতে করিতে তাহার বিরক্তি অপনোদন করিয়া তাহাকে খুশী করিয়া তুলে! সেই অবসরে আবার তাহাদের বাড়ীরও দুই-চারিটা গোপন সংবাদ জানিয়া লয়!

গাড়ু হইতে বাটিতে জল ঢালিয়া লইয়া সে আরম্ভ করিল—কঙ্কণাতে হৈ হৈ কাণ্ড। আজ্ঞে, বুঝলেন কিনা! তাঁবু পড়েছে আট-দশটা,—গাড়ী গাড়ী কাগজ জড়ো হয়েছে!

—হুঁ—সেট্‌লমেণ্ট্ ক্যাম্প বসেছে।

কৌশলী তারাচরণ বুঝিল—এ সংবাদে গোমস্তার চিত্ত সরস হইবে না। চকিত-দৃষ্টিতে শ্রীহরির মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল—শ্রীহরির মুখও গম্ভীর। মুহূর্তে সে প্রসঙ্গান্তরে আসিয়া বলিল—এবার পোয়া বারো হল দুর্গা-টুর্গার। দু'হাতে টাকা লুটবে। টেরিকাটা আমিনের দল যা দেখলাম! বুঝলে ভাই পাল!

গোমস্তা ধমক দিল—পাল কি রে, ভাই কি রে? ভাই পাল বলিস কেন? ওকে তুই 'ভাই পাল' বলবার যুগ্যি? 'বুঝলেন' বলতে পারিস না?

—আজ্ঞে?

—ঘোষমশায় বলবি। পাল হল যারা নিজের হাতে চাষ করে। এ গাঁয়ের মাথার ব্যক্তি হলেন শ্রীহরি।

তারাচরণ নীরবে সব শুনিতে আরম্ভ করিল। অনেক কথাই শুনিল—মায় এ গ্রামের গোমস্তাগিরিও যে শ্রীহরি ঘোষ মহাশয় লইতেছেন, সে কথাটাও আভাসে সে অনুমান করিয়া লইল। তৎক্ষণাৎ বলিল—একশোবার হাজারবার, ঘোষমহাশয়ের তুল্য ব্যক্তি এ ক'খানা গাঁয়ে কে আছে বলুন? গোমস্তার গালের উপর ক্ষুরের একটা টান দিয়া সে চাপা গলায় বলিল—উনি ইচ্ছে করলে দুর্গার মত বিশটা বাঁদী রাখতে পারেন!

হাত তুলিয়া ইঙ্গিতে ক্ষুর চালাইতে নিষেধ করিয়া দাশজী মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিল—অনিরুদ্ধ কামারের বউটা দুর্গার সঙ্গে জোট বেঁধে বেড়ায় কেন রে? ব্যাপার কি বল তো?

—তাই নাকি? আজই খোঁজ নিচ্ছি দাঁড়ান। তবে কর্মকারের সঙ্গে দুর্গার আজকাল একটুকু—তারাচরণ হাসিল।

—নাকি?

—হ্যাঁ!

শ্রীহরি চুপ করিয়া বসিয়াছিল। পদ্মকে লইয়া এমনভাবে আলোচনা তাহার ভাল লাগিতেছিল না। ওই দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটির প্রতি তাহার আসক্তি প্রচণ্ড—কামনা প্রগাঢ়, যে আসক্তি ও যে কামনাতে মানুষ মানুষকে, পুরুষ নারীকে একান্তভাবে একক ও নিতান্তভাবে নিজস্ব করিয়া পাইতে চায়, এক জনশূন্য লোকে—সে তাহাকে চায় চোরের সম্পদের মতো; অন্ধকার গুহার নিস্তব্ধতম আবেষ্টনীর মধ্যে সর্পের সর্পিণীর মতো—শতপাকের নাগপাশের বন্ধনের মধ্যে।

* * *

পদ্মের বাড়ী আসিয়া দুর্গা দেখিল—পদ্ম আবার স্নানে যাইবার উদ্যোগ করিতেছে। পদ্ম দ্রুতপদে চলিয়া আসিবার কিছুক্ষণ পর দুর্গা কিছুক্ষণ একটা গলির আড়ালে লুকাইয়া দাঁড়াইয়াছিল। গোমস্তাটিকে সে ভাল করিয়াই জানে! শ্রীহরির তো নখ হইতে মাথার চুল পর্যন্ত তাহার নখদর্পণে। তাহাদের কথাবার্তা শুনিবার জন্যই সে লুকাইয়া দাঁড়াইয়াছিল। গোমস্তার কথা শুনিয়া সে হাসিল; শ্রীহরির কথাবার্তার ধরনে সে অনুভব করিল বিস্ময়! তারাচরণ আসিতেই সে চলিয়া আসিয়াছে! গামছা কাঁধে ফেলিয়া পদ্ম তখন বাড়ী হইতে বাহির হইতেছিল। দুর্গা প্রশ্ন করিল—এ কি? আবার চান?

—হ্যাঁ।

—ছোঁয়াচ পড়লো বুঝি ? যে পাঁচ হাত 'সান' তোমার ! কিছু ছোঁয়াটা আর আশ্চর্য্য কি !

অপ্রস্তুতের মত হাসিয়া পদ্ম বলিল—না—মাড়াই নাই কিছু।

—তবে ?

—ছেলেতে ময়লা করে দিলে কাপড়।

—তোমার ওই এক বাতিক, ছেলে দেখলেই কোলে নেবে। নিজের ন'ই, পরের নিয়ে এত ঝঞ্ঝাট বাড়াও ক্যানে বল তো ? এর মধ্যে আবার কার ছেলে নিতে গেলে।

পদ্ম এবার অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া একটু হাসিল,—ছিরু পালের ছেলে।

দুর্গা অবাক হইয়া গেল।

পদ্ম বলিল—গলির মুখে বউটি দাঁড়িয়ে কাঁদছিল, কোলে ছোটটা ঘ্যান-ঘ্যান্ করছে, পায়ের কাছে বড়টা কোলে চাপবার জন্যে মায়ের কাপড় ধরে টেনে ছিঁড়ে একাকার করছে আর চেঁচাচ্ছে ; বাড়ীর ভেতরে শাশুড়ী গাল পাড়ছে—বিয়েনখাগী, সব খেয়েছিস্, আর ও দু'টো ক্যানে ? ও দু'টোকেও খা, খেয়ে তুইও যা ; আমি বাঁচি। তাই ছোটটাকে একবার নিলাম—মা তখন বড়টাকে নিয়ে চুপ করালে। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে আবার বলিল—পালের বউটি কিন্তুক বড় ভাল মেয়ে, বড় ভাল। তাহার মনে পড়িয়া গেল সেই সেদিনের কথা।

শ্রীহরির স্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্গার কোন অভিযোগ নাই, বরং তাহার কাছে তাহার নিজেরই একটি গোপন অপরাধ-বোধ আছে। এ গ্রামের বধূদের সকলেই তাহাকে অভিসম্পাত দেয়, কটু কথা বলে—সে কথা সে জানে। কেবল দু'টি বউয়ের বিরুদ্ধে সে এ অভিযোগ করিতে পারে না ; একজন বিলু দিদি—পণ্ডিতের স্ত্রী, অপর জন শ্রীহরির স্ত্রী। পণ্ডিতের স্ত্রীর না করিবারই কথা—পণ্ডিত সম্বন্ধে তো তাহার আশঙ্কার কিছু নাই, সে সাধু লোক ; কিন্তু ছিরুর সহিত তাহার প্রকাশ্য ঘনিষ্টতা সত্ত্বেও শ্রীহরির স্ত্রী কোনদিন তাহাকে কটু কথা বলে নাই—অভিসম্পাত দেয় নাই। পালের স্ত্রীর সঙ্গে চোখে চোখ রাখিতে তাহার সত্যই লজ্জা-বোধ হয়।

কিছুক্ষণ নীরবে পথ চলিয়া, অকস্মাৎ বোধ হয়, শ্রীহরির স্ত্রীর প্রসঙ্গ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্যই সে প্রসঙ্গান্তরের অবতারণা করিল ; বলিল—কে জানে ভাই ; কচি-কাঁচা দেখলে আমার তো গা ঘিন্-ঘিন্ করে ! মা গো !

পদ্ম অত্যন্ত রুঢ়দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিল !